দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

জাতীয় শিক্ষানীতি ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার

অধ্যাপক আবদুল নূর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থ ও বিশ্বাসের কথা উল্লেখ্য করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৮(১)। এর প্রস্তাবনায় (Preamble) এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, এই মহান আদর্শই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এজাতীয় বক্তব্যের অনুসমর্থন পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে, যেখানে নিপীড়িতের পক্ষ হয়ে অগ্রাসী শক্তি ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিবাদের/জেহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (সুরা বাকারা ২ : ২১৬-২১৭, ২৫১; সুরা হজ্জ, ২২ : ৪০ এবং সুরা নিসা ৪ : ৭৫)। এই সংবিধানের প্রতি আনুগত্য এবং এর মৌল নীতিমালার আলোকে সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় নীতি-নির্ধারকগণ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ সদস্যগণ) ক্ষমতায় সমাসীন হয়েছেন (অনুচ্ছেদ ১৪৮ : তৃতীয় তফসিলে উল্লেখিত 'শপথ ও ঘোষণা')।

উপরোল্লিখিত সাংবিধানিক ধারাটি বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে সকল পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন তদনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালিত হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শূরা (আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ)-ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন (সুরা- শূরা ৪২ : ৩৮; সুরা মুজাদালা : ৯)। আমাদের দেশে নির্বাচিত সরকার অবশ্য ক্ষমতা গ্রহণের পর-পরই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশে 'পার্লামেন্টারী' পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ফরাসী 'পার্লে' শব্দ থেকে পার্লামেন্টারী শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ হচ্ছে আলাপ-আলোচনা। শব্দার্থের দিক থেকে 'শূরা ও 'পার্লে'? সমার্থক হলেও দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীন থাকার কারণে আমরা ইউরোপীয়ান পরিভাষার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং, নাম যাই হোক না কেন, পদক্ষেপটি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ অনুমোদিত/নির্দেশিত পথ, তা অনস্বীকার্য।

জাতীয় সমস্যা : সন্ত্রাস ও দুর্নীতি :

বাংলাদেশের সংবিধানে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র উপর আস্থা ও বিশ্বাস শুধু রাষ্ট্র পরিচালনা নয় তা নাগরিকদেরও কার্যের ভিত্তি হইবে (অনুচ্ছেদ ৮(২)। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ, যার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০-ভাগ হচ্ছে মুসলিম বা আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এ দেশের জাতীয় মস্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে 'সন্ত্রাস' ও 'দুর্নীতি'। এ দু'টি জাতীয় সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকারকে দু'টি বিশেষ সাংবিধানিক কমিটি গঠন করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী আইনও পাস হয়েছে। নতুন করে দুর্নীতিবিরোধী কঠোর আইন পাসের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে জানা গেছে। 'সন্ত্রাস' ও দুর্নীতি যে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর নির্দেশনা পরিপন্থী আচরণ, তা বলাই বহুল্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে, 'লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরধে' অর্থাৎ পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ/বিপর্যয় সৃষ্টি করো না (২৮ : ৭৭)। নিজেদের মধ্যে শক্তি প্রদর্শন বা অস্ত্রের মহড়া নয় বরং আল্লাহ্‌ বলছেন, 'ফাস্‌তাবিকুল খায়রাত' অর্থাৎ তোমরা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা কর (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৮)। সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে, অন্যের কাছ থেকে যে আচরণ তুমি পেতে চাও না অন্যের সাথে সে জাতীয় আচরণ তুমি করো না; উদ্‌ফা বিল্লাতি হিয়া আহসানু সাইয়েআত' অর্থাৎ মন্দের মোকাবেলা কর উত্তম দ্বারা, তাহলে চরম শত্রুও পরিণত হবে পরম বন্ধুতে (২৩ : ৯৬; ৪১ : ৩৪)। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রসুল (সঃ) আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : "সেই সত্যিকার মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মানুষ নিরাপদ থাকে।" অতএব, সর্বশক্তিমানে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় আস্থাশীল ও বিশ্বাসী মানুষ কখনও সন্ত্রাসী হতে পারে না, কেননা, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে তার বিশ্বাস ও বিশ্ব-দর্শন যা পরিশ্রুত হয় শিক্ষা ও সামাজীকিকরণের মাধ্যমে।

অনুরূপভাবে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে সার্বভৌম আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি। অতএব, তাঁদের উপর অর্পিত ক্ষমতা হচ্ছে পবিত্র আমানত (হাদীছ)। অতএব, এটা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য যে, তারা সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন (বুখারী শরীফ); এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজের স্বার্থের নীচে স্থান দেবেন (বুখারী শরীফ); কাউকে কোন (সরকারী) দায়িত্বে নিয়োগ করা হলে তাকে বেতন-ভাতা দেওয়া হবে, এরপর তিনি যদি কারও (মক্কেল/জনগণ) কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন তাহলে সেটা হবে বিশ্বাস ভংগের (Breack of trust) কাজ (আবু দাউদ); ঘুষখোর, ঘুষদাতা আর দু'জনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সবাই সমপর্যায়ের গুনাহগার (অহলে সুনান)। ইসলাম প্রশাসকদের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি করে যে, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কি-না সেটা প্রভু আল্লাহ্‌ সার্বক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন এবং এ জন্য তাদেরকে শেষ বিচারের দিন প্রভু আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে (সুরা বাকারা- ২ : ২০৩, ২৮১ : সুরা মুদ্দাছির : ৩৮; সুরা নিছা ৪: ৮৭)।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা :

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত জাতীয় সমস্যাদ্বয়ের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে সরকারী প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা আবার পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে উপকরণ (Input) সংগ্রহ ও উৎপন্ন (output) সরবরাহের মাধ্যমে টিকে থাকে। আবার এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় নায়কগণ (সরকারী আমলা ও ছাত্র) আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ তথা (সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি পরিপন্থী) নৈতিকতা আদর্শ বিবর্জিত ও লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল। তাই বিগত ২৭ জুলাই (১৯৯৩) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলছেন : যে শিক্ষা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়, বেকারত্ব বাড়ায়, মেধার অপচয় ঘটায় এবং দুর্নীতি (নকল)প্রবণতা বৃদ্ধি করেদ সে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৮ জুলাই, ১৯৯৩ ইংরেজী)। এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় দৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সঃ) বলেছেন : 'আমরা সেই জ্ঞান থেকে পানা চাই যা মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বহন করে না।' (ইবনে মাজা)। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর প্রার্থনা। 'হে প্রভু! আমি তোমার কাছে কল্যাণ দানকারী জ্ঞান, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল করার সাহায্য কামনা করছি' (বয়ানিল ইলম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬২)। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেরও একটি বিশ্বজনীন দোয়া হচ্ছে : 'রাব্বি হাব্‌লি হিকমাতাও ওয়াআল হিক্‌নি বিস্‌ সোয়ালিহীন অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর (২৬ : ৯৩)।

সমাজে কল্যাণমূলক আচরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার ব্যাপারে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ সরকার ও জনগণের জন্য অনুসরণযোগ্য কি পথনির্দেশিকা দিয়েছেন তা জানার উপায় হচ্ছে- দেশব্যাপী ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটান। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উপরোল্লিখিত সাংবিধানিক দায়িত্বটি পালনের ব্যাপারে সরকার ও সরকারী অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কতদূর সচেতন/প্রতিশ্রুতিশীল তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার অবস্থান :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে জাতিগঠনমূলক কর্মে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকারী কর্ম-কমিশন। এই উদ্দেশ্যে কমিশন প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ৩০০ নাম্বারের ঐচ্ছিক বিষয় নেবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে সে বিষয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ইসলামী শিক্ষা পড়ানোর ঐতিহ্য চলে আসছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের অবস্থা খুবই করুণ। এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সারা দেশে ১৩টি সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে। কিন্তু এতে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য পৃথক কোন বিভাগ না থাকায় প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে সারা দেশে মোট ২০৪টি সরকারী ডিগ্রী কলেজের মধ্যে মাত্র ৫৯টিতে ইসলামী শিক্ষা পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। তাও স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে এনাম কমিশনের সুপারিশের আলোকে। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়দ্বয়কে একত্রিভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অধিক হারে ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগের সুযোগটি সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এবং এভাবে ইসলামী শিক্ষার মত এমন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে অবনমিত করা হয়েছে।

অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগের কলেজসমূহে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথক বিষয় হিসাবে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, আরবী, পালি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির চাইতেও অধিক হারে 'ইসলামী শিক্ষা' নিয়ে পড়াশুনা করে থাকে (ছক নং-১)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, উক্ত বিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভের দীর্ঘ ২৫ বৎসর পরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজঅবধি 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ে পৃথক কোন বিভাগ খোলা হয়নি (ছক নং-১)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ১৯৯২ সালের বিএ পরীক্ষায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন অনুমোদিত বিষয়সমূহে পরীক্ষার্থীদের বিবরণ :

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
দর্শন	১৩,৬৭৭
ইতিহাস	১,৬১০
মনোবিজ্ঞান	৫৪৮
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১৯,৪৩১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৩,১৯১
ইসলামী শিক্ষা	৪,১৮৫
আরবী	৬৭
সমাজতত্ত্ব	২,১৪০
সমাজকল্যাণ	৮,৩৮৯
অর্থনীতি	৭,৫০৯
পালি	৯৩৯
সংস্কৃতি	১৭
ভূগোল	৪৮২
লোক প্রশাসন	৩০

উৎস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষাকে পৃথক বিভাগের আওতায় পড়ানোর সুব্যবস্থা না থাকার কারণে বহুসংখ্যক আগ্রহী প্রার্থী সরকারী কমিশন পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারী কর্ম কমিশন পরিচালিত উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর মাষ্টার্স ডিগ্রী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্নাতক ও মাষ্টার্স পর্যায়ে পৃথক পাঠ্যসূচী হিসাবে 'ইসলামী শিক্ষা' পড়ার সুযোগ না পেলে বা পড়াবার/ব্যবস্থা না করলে প্রার্থীগণ উক্ত বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে? অতএব, জাতিগঠনমূলক কর্মে অংশগ্রহণ এবং 'সন্ত্রাস' ও দুর্নীতির মত জাতীয় সমস্যা প্রতিরোধ 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জননির্বাচিত সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন- এটা শুধু সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্বই নয়, এটা সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল-নীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর তাদের আস্থা ও বিশ্বাস কতদূর দৃঢ় তা পরীক্ষিত হবারও বিষয়।